মানববিদ্যা গবেষণাপত্র পঞ্চম সংখ্যা ॥ আষাঢ় ১৪২৯ ॥ জুলাই ২০২২ ॥ ISSN 2518-5853
কলা অনুষদ ॥ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

মাসুম রেজার *নিত্যপুরাণ*: মহাভারতের একলব্য চরিত্রের বিনির্মাণ

ফারজানা আফরীন রূপা*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: 'বিনির্মাণ' প্রক্রিয়ায় মূল পাণ্ডুলিপিকে অনুপুঙ্খ পাঠপূর্বক পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয় এর অন্তঃর্নিহিত বিষয়ের নব ব্যাখ্যাকে। বাংলা সাহিত্যে বিশেষত নাটকে মহাভারত-রামায়ণ ভিত্তিক বিনির্মাণের ইতিহাস প্রাচীন। আধুনিক বাংলা মঞ্চ নাটকের বিশিষ্ট নাট্যকার মাসুম রেজার রচনায় সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত যেমন গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে, তেমনি উঠে এসেছে পুরাণ এবং ইতিহাসের তুলনামূলক কম আলোচিত অধ্যায় ও চরিত্র। মহাভারতের নাতিদীর্ঘ একলব্য আখ্যান কেন্দ্রিক তাঁর এমনই এক রচনা *নিত্যপুরাণ*। মহাভারতে নিষাদরাজ হিরণ্যধনু পুত্র একলব্য। অস্ত্রশিক্ষায় শিষ্যত্ব প্রার্থনা করলে দ্রোণাচার্য কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। দ্রোণাচার্যের মৃন্ময় মূর্তিকে গুরুর আসনে বসিয়ে অপমানিত একলব্য অধ্যবসায় গুণে অস্ত্রশিক্ষায় সাফল্যের শিখরে পৌছায়। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত অর্জুন-আচার্যের মিলিত চক্রান্তে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ দ্রোণাচার্যকে ডান হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী দান করে শৌর্যহীন জীবন নিয়ে বেঁচে থাকে। মহাভারতের একলব্য আখ্যানের ঘটনাবলী অবিকৃত রেখে, নাট্যকার নাটকের বিস্তৃত পরিসরে একলব্য-পঞ্চপান্ডব-দ্রোণাচার্য, এমনকি পঞ্চপাণ্ডব ভার্যা দ্রৌপদীর চরিত্রকেও পরস্পর মুখোমুখি করে ভিন্নরূপে উপস্থাপন করেছেন। বিশেষত মহাভারতের অল্পবিস্তারী একরৈখিক একলব্য চরিত্র নাটকে বিনির্মিত হয়ে পেয়েছে পূর্ণ এক মানবীয় অবয়ব, যার দ্বারা উন্মোচিত হয়েছে এই চরিত্রকে কেন্দ্র করে মানব মনে জেগে ওঠা প্রায় সকল সম্ভাবনার দ্বার। 'পাঠ/আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি' অনুসরণ করে *নিত্যপুরাণ* নাটকে বিনির্মিত একলব্য চরিত্রকে আর্যসম্প্রদায়ের বর্ণবিদ্বেষ ও দমন পীড়ন নীতির শিকার অথচ বিদ্রোহী-সহৃদয়-করুণ-নিঃসঙ্গ মানবরূপে আবিষ্কার এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

মহাকাব্য *মহাভারত*, ভারতবর্ষের সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপকে ধারণ করেছে নিজ মধ্যে। কালে কালে কবি সাহিত্যিকরা মহাভারতের অসংখ্য ঘটনা ও চরিত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত

* সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

হয়েছেন। কখনো মহাকাব্যের অনুগামী হয়েছে তাঁদের চিন্তাধারা আবার কখনো ঘটনাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করেছেন, মহাভারতের চরিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে শিল্পীর একান্ত নিজস্ব ভাববাহীতায়। মাসুম রেজার নাটক *নিত্যপুরাণ*, মহাভারতের একলব্য আখ্যান কেন্দ্রিক এমন এক সৃষ্টি। মহাভারতের ক্ষুদ্র একলব্য আখ্যানের 'একলব্য' কে কেন্দ্র করেই নাটকের কাহিনী বিস্তার লাভ করেছে। বীর একলব্যকে নাট্যকার দেখিয়েছেন তার কালের শ্রেষ্ঠ বীর হিসেবে, যাকে দমন করতে দ্রোণাচার্য এবং পাণ্ডবরা বেছে নেয় কূটচাল। শ্রেণিবিভাজনের নিষ্ঠুর বলি হয় অমিত সম্ভাবনাময় বীর একলব্য। নাটকেও মহাভারতের ঘটনার অনুসরণ আমরা দেখতে পাই। কিন্তু মহাভারতের মূল ঘটনার সাথে মিলিয়ে—নাট্যকার কল্পিত অথচ মহাভারত বহির্ভূত ঘটনার মিশেলে নাট্যকার একলব্য চরিত্রকে পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে আংশিক নয় বরং এক পূর্ণ মানবীয় অবয়ব দান করেন নাটকে। যাকে বলা যায়, পাঠক সম্মুখে মহাভারতের একলব্য আখ্যানে প্রাপ্ত একলব্য চরিত্রকে এক নতুন ব্যাখ্যায় তুলে ধরা। সাহিত্যিক অভিধায় পাঠ ও বিশ্লেষণ পূর্বক মূল শিল্পকে নব ব্যাখ্যায় উপস্থাপনের এই প্রক্রিয়াকে "বিনির্মাণ" বলে অভিহিত করা হয়।

প্রকৃতত বিনির্মাণ প্রক্রিয়া সাহিত্য বিশ্লেষণের একটি পদ্ধতি। একটি পাঠকে পুনঃ পুনঃ পাঠ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠাভ্যন্তরের অন্তঃর্নিহিত বিষয় উন্মোচন পূর্বক নতুন ব্যাখ্যা শিল্প রসিক বা পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয় বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায়। তাত্ত্বিক কবীর চৌধুরী তাঁর *সাহিত্যকোষ* গ্রন্থে বিনির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন: "এ প্রক্রিয়ায় একটি টেক্সটকে সযত্নে পড়ে, বাইরের সব প্রভাব বর্জন করে, শুধু টেক্সটের ভেতর থেকেই তার যাবতীয় অর্থ ছেঁকে তোলার চেষ্টা করা হয়।" (চৌধুরী ২০০৮: ৪৯) কোন পাণ্ডুলিপির আখ্যান বা চরিত্রের বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় লেখক প্রধান অবলম্বন করেন মূল পাঠকেই, অসম্ভব কল্পনাবিলাসী মনের স্বেচ্ছাচারীতা অথবা বিধ্বংসী মনোভাব এক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য বলেই গণ্য হয়। আখ্যান বা চরিত্রের বিনির্মাণে মূল পাণ্ডুলিপির ঘটনাবলীর সাথে সম্ভাব্য ঘটনাবলীর যৌক্তিক মিশেলে, মূল পাণ্ডুলিপিস্থিত ব্যাখ্যার সাথে লেখকের নবচিন্তা ও ব্যাখ্যা মিলে পাঠক-সমালোচকের ভাবনায় এক নবদ্বার উন্মোচিত হয়।

মহাভারতের একলব্য আখ্যান নিম্নরূপ:

> ...নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য দ্রোণের কাছে শিক্ষার জন্য এলেন, কিন্তু নীচজাতি ব'লে দ্রোণ তাঁকে নিলেন না। একলব্য দ্রোনের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম ক'রে চলে গেলেন এবং দ্রোনের একটি মৃন্ময়ী মূর্তিকে আচার্য কল্পনা ক'রে নিজের চেষ্টায় অস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করতে লাগলেন।
>
> একদিন কুরুপাণ্ডবগণ মৃগয়ায় গেলেন, তাঁদের এক অনুচর মৃগয়ার উপকরণ এবং কুকুর নিয়ে পিছনে পিছনে গেল। কুকুর ঘুরতে ঘুরতে একলব্যের কাছে উপস্থিত হ'ল এবং তাঁর কৃষ্ণ বর্ণ, মলিন দেহ, মৃগচর্ম পরিধান ও মাথায় জটা দেখে চিৎকার করতে লাগল। একলব্য একসঙ্গে সাতটি বাণ ছুঁড়ে তার মুখের মধ্যে পুরে দিলেন, কুকুর তাই নিয়ে রাজকুমারদের

> কাছে গেল। তাঁরা বিস্মিত হয়ে একলব্যের কাছে এলেন এবং তাঁর কথা দ্রোণাচার্যকে জানালেন। অর্জুন দ্রোণকে গোপনে বললেন, আপনি প্রীত হয়ে আমাকে বলেছিলেন যে আপনার কোনও শিষ্য আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে না, কিন্তু একলব্য আমাকে অতিক্রম করলে কেন? দ্রোণ অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে একলব্যের কাছে গেলেন, একলব্য ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে রইলেন। দ্রোণ বললেন, বীর, তুমি যদি আমার শিষ্যই হও তবে গুরুদক্ষিণা দাও। একলব্য আনন্দিত হয়ে বললেন, ভগবান, কি দেব আজ্ঞা করুন, গুরুকে অদেয় আমার কিছুই নেই। দ্রোণ বললেন, তোমার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ আমাকে দাও। এই দারুণ বাক্য শুনে একলব্য প্রফুল্লমুখে অকাতরচিত্তে অঙ্গুষ্ঠ ছেদন ক'রে দ্রোণকে দিলেন। তার পর সেই নিষাদপুত্র অন্য অঙ্গুলি দিয়ে শরাকর্ষণ ক'রে দেখলেন, কিন্তু পূর্ববৎ শীঘ্রগামী হ'ল না। অর্জুন সন্তুষ্ট হলেন। (ব্যাস ২০০৯: ৭৮-৭৯)

মহাভারতে প্রাপ্ত একলব্য আখ্যান নাতিদীর্ঘ। ক্ষুদ্র এই আখ্যানে একলব্য নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলী গুরুদক্ষিণা দিয়ে শিষ্যের দায়িত্ব পালন করে। গুরুভক্ত শিষ্যের পরিচয়ে কালে কালে উদাহরণ হয়ে থাকা একলব্য ও তার গুরুভক্তির বিষয়টিকে নাট্যকার মাসুম রেজা নাটকের কেন্দ্রে রেখে মহাভারত থেকে বিচ্যুত হননি। কিন্তু যুগের শ্রেষ্ঠ বীর একলব্যকে চূড়ান্ত পরিণতিতে সমাজ সংস্কার আর কূট চক্রান্তের অসহায় শিকার রূপে তুলে ধরতে গিয়ে, চরিত্রাভ্যন্তরের সমস্ত সম্ভাবনাকে প্রস্ফূটিত করে এক পূর্ণ মানবরূপে তুলে ধরেছেন *নিত্যপুরাণ* নাটকে। নাটক রচনা অভিপ্রায় অংশেই নাট্যকার স্পষ্ট করেছেন তাঁর উদ্দেশ্য:

> নিত্যপুরাণ নাটকে একলব্য মূল নায়ক। ...মহাভারত পড়তে গিয়ে আমার বরাবরই মনে হয়েছে একলব্য মহাভারতের অন্যতম প্রধান নায়ক। নিচু জাতের সন্তান হওয়ায় যোগ্যতর হয়েও যে প্রাপ্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তার চাওয়া পাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সমাজ ও সংস্কার। (রেজা ২০০৪: ৮)

নিত্যপুরাণ নাটকের প্রারম্ভেই যে একলব্যকে দেখা যায়, সে পুরাণের একলব্য নয়— বরং পুরাণকে পাল্টে দেবার প্রতিজ্ঞায় বর্তমানে আবির্ভূত। নবপুরাণের এই একলব্য আর্জি জানায় তারই মত নিম্নবর্গের সন্তান মহাভারত রচয়িতা ব্যাসদেবের কাছে— নতুন করে তাকে যেন গড়া হয়। এজন্মে তাকে যেন দেওয়া হয় পাণ্ডবদের কূটিলতা বোঝার ক্ষমতা। তাই হয়, নতুন লেখকের আহ্বানে মহাভারতের বীর একলব্য শৌর্যহীনতার পুরানো ক্ষত নিজের মধ্যে ধারণ করে নবরূপে আবির্ভূত হয় পুরাণ বদলের মানসে। নবজন্মের এই একলব্যকে প্রথমেই সর্জবনে দ্রোণাচার্যের মৃন্ময় মূর্তিকে গুরুজ্ঞানে ভক্তি প্রদর্শন করতে দেখা যায়। মহাভারতের গুরুভক্ত এই শিষ্য নাটক ভক্তি প্রদর্শনে একলব্য ব্রাহ্মণ্য চিহ্নিত শ্রদ্ধা প্রদর্শক কোন নিয়ম অনুসরণ করেনি, বরং ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী সোজা রেখে বাকী চার আঙ্গুলের সাহায্যে মুষ্টিবদ্ধ করেই তার গুরুভক্তি জানায়। নাটকের একলব্যের এই ব্যতিক্রমী শ্রদ্ধা শুরুতেই জানান দেয় শুধুই গুরুভক্ত শিষ্য এই একলব্য নয়! এই একলব্যের মধ্যে আছে ক্ষোভ, প্রচলিত নিয়মকে তুচ্ছ জ্ঞান করার অসামান্য মনোবল। মুহূর্তেই গুরুভক্তিকে ছাপিয়ে একলব্যের স্মৃতিতে জেগে ওঠা হস্তিনাপুরে দ্রোণাচার্য কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পূর্বজন্মের অপমানবোধ তাকে তাড়িত করে সম্মুখ পানে:

> ...হোম সমাপনান্তে আপনি দর্শন দিলেন আমায় মেঘমন্দ্রতুল্য বৈদিক কণ্ঠে আপনি জানতে চাইলেন আমার আগমনের উদ্দেশ্য, 'কে তুমি, কী হেতু আগমন তোমার?' ...শিখতে চাই, আপনার স্নেহধন্য হয়ে, আচার্য, শিখতে চাই আপনার জানা সমস্ত অস্ত্রচালনা কৌশল। ...অতঃপর আপনি আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। ...বললাম, আমি নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য। অমনি আপনি ফেরালেন মুখ, উদ্যত হলেন যেতে। অবজ্ঞাভরে প্রায় অস্ফুটে বললেন, 'ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় ব্যতীত কোন নিম্নবর্ণের সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া আমার শাস্ত্রবিরুদ্ধ।' ...ধীরে আপনি চলে গেলেন আপন কার্যে। (রেজা ২০০৪: ১৫-১৬)

জাতিভেদ ও বর্ণ বৈষম্য মহাভারতের প্রায় সর্বত্রই দৃশ্যমান। একলব্য নিম্নবর্ণের সন্তান এই কারণেই বঞ্চিত হয় দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে শিক্ষালাভে। নাটকে শুধুমাত্র বর্ণের প্রসঙ্গ দ্রোণাচার্য উল্লেখ করলেও, বস্তুত যে আর্য-নিষাদ ভেদে একলব্য বঞ্চিত হয়, তা যতটা নিম্নবর্ণের কারণে ততোধিক নিষাদ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি একলব্যের উত্তরকালে যুদ্ধকৌশলে কৌরব পাণ্ডবদের ছাড়িয়ে যাওয়ার ভয়ে। এখানে কৌরব- পাণ্ডবদের তুলনায় একলব্য তথা নিষাদ জনগোষ্ঠীর এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার ভয়কে বর্ণভেদ দ্বারা আড়াল করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহাভারতে নিষাদ রাষ্ট্রের উপস্থিতি দেখা যায় অনেক স্থানেই। এই নিষাদরা যুদ্ধপ্রিয় আর্য জনগোষ্ঠী দ্বারা তাড়িত হয়েছে ঠিকই কিন্তু যুদ্ধে কুশলী নিষাদ জনগোষ্ঠী নিজেদের অস্তিত্ব ও সংস্কৃতি টিকিয়ে রেখেছিল আর্যদের পাশাপাশি অবস্থানে থেকেই। কালান্তরে আর্য নিষাদদের মাঝে শত্রুতা থাকলেও পরস্পরের প্রতি দিনে দিনে ঘৃণা কমে এসেছিল, সুসম্পর্ক স্থাপন না হলেও পার্শ্ববর্তী রাজত্বে অবস্থানের মত সহনশীলতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। নাটকেও হস্তিনাপুরের পৌঁছায় একলব্য একরাজ্য পাড়ি দিয়ে একথাটির স্পষ্ট উল্লেখ আছে, পরস্পর নিকটবর্তী রাজত্বে সমশক্তির জনগোষ্ঠী ছাড়া অবস্থান অকল্পনীয়। তাই বলা যায় নিষাদ জনগোষ্ঠীকে পশ্চাদপদ করে রাখার প্রক্রিয়া হিসেবেই দ্রোণাচার্য আর্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর হাতে থাকা সর্বোত্তম অস্ত্র বর্ণভেদকেই অবলম্বন করেছিলেন।

মহাভারত অনুসারেই *নিত্যপুরাণ* নাটকের একলব্যের পূর্বস্মৃতিতে দেখা যায় নিষাদপুত্র বলে একলব্যকে দ্রোণাচার্য শিষ্যত্ব দানে অসম্মত হন ঘৃণাভরে। মহাভারতের কবি একলব্যের মানসিক অবস্থার বিশদ বিবরণ দেন নি এই পর্যায়ে, কিন্তু নাট্যকার ঐ মুহূর্তের অপমানিত একলব্যকে পৃথিবীর সবচেয়ে একা, স্বপ্নপূরণে ব্যর্থ এক আশাহত মানবরূপে তুলে ধরেছেন। অসম্মানিত একলব্যের যখন সম্বিত ফিরে, তখন কঠিন দুঃসাধ্য প্রত্যয়ে নিজেকে বেঁধে ফেলে। সর্জবনে গুরুজ্ঞানে দ্রোণাচার্যের মৃন্ময় মূর্তি গড়ে অস্ত্রশিক্ষা করতে থাকে এবং সফলকাম হয়। কালে দ্রোণাচার্যের প্রিয় শিষ্য বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন থেকেও কুশলী বীরে পরিণত হয় একলব্য নিজ অধ্যবসায় গুণে। *মহাভারত* এবং *নিত্যপুরাণ* নাটক উভয় ক্ষেত্রেই অর্জুনের প্রিয় কুকুরের স্বরশক্তি রোধ করেই একলব্য প্রথম তার অস্ত্রশিক্ষার কুশলতার পরিচয় দেয়। কিন্তু মহাভারতে অর্জুনের প্রিয় কুকুর বনচারী একলব্যকে দেখে হৈ চৈ শুরু করে অদ্ভুত জটপাকানো চুল, স্বল্প বসন, হাতে

তীর ধনুক, গায়ের নিকষ কালো বর্ণ দেখে আর একলব্য অনুশীলনে ব্যাঘাত ঘটায় কুকুরের স্বররোধ করে সপ্ত শর প্রয়োগে। অন্যদিকে *নিত্যপুরাণ* নাটকের একলব্য তার জীবনের ভবিতব্যকে পাল্টে দেবার মানসে নতুনকালে আবির্ভূত, তাই অনুশীলনের মগ্নতায় বিঘ্ন ঘটানো অর্জুনের সারমেয়র স্বররোধ ঘটায় না দেখেই অস্ত্রলাঘবের মাধ্যমে। ভবিষ্যত জানা একলব্যের পঞ্চপাণ্ডবের মনে বিস্ময় জাগিয়ে নিজের স্থানে ডেকে আনাও এর পিছনের অন্যতম এক উদ্দেশ্য বটে। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় না, অনন্য কৌশলে কুকুরের স্বররোধ দেখে ছুটে আসা বিস্মিত অর্জুনের কাছে নিজের পরিচয় একলব্য ব্যক্ত করে এরূপে:

> আপনার প্রিয় কুকুরের কণ্ঠনালীতে আমি একযোগে শপ্তস্বর প্রোথিত করেছি। তবুও জীবন নাশ ঘটেনি তার, ঘটেনি একফোঁটা রক্তপাত, তার চলৎশক্তি আছে চলৎশক্তিরূপে, শ্রুতি কিংবা দর্শনেও তার ঘটেনি এতটুকু ব্যাঘাত। শুধু রুদ্ধ হয়েছে তার কণ্ঠ, চিৎকারে অক্ষম সে এখন। শপ্তস্বর নিক্ষেপের এই অভূতপূর্ব অসাধারণ শৌর্য থেকে কি আমার পরিচয় স্পষ্ট নয়? (রেজা ২০০৪: ১৯)

মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডব সারা মুখে শরবিদ্ধ বাকরুদ্ধ কুকুরটিকে যখন দেখল, তখন বিস্মিত হল না দেখা অসীম কুশলী ক্ষমতাধর ব্যক্তিটির কথা ভেবে। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন তার চেয়ে কুশলী এই বীরের প্রতি বিস্ময়ের চেয়ে বেশী যা পোষণ করল, তা হল হিংসা। দেখা হল একলব্য আর পঞ্চপাণ্ডবের। একলব্য তখন একাগ্রচিত্তে অস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত। অর্জুনের প্রিয় কুকুর যে কারনে চিৎকার করে উঠেছিল, প্রথম দর্শনে পঞ্চপান্ডবেরও বিরাগভাজন হয় একলব্য ঠিক একই কারণে, বনচারী যুবকের চেহারা আর্যোচিত নয়। মহাভারতে পাণ্ডবরা একলব্যের পরিচয় জানতে চাইলে সরল একলব্য নিজের রাজ পরিচয়, দ্রোণাচার্যের শিষ্যত্ব বিশদভাবে জানিয়ে নিজের সম্যক পরিচয় ব্যক্ত করে। মহাভারতের একলব্যের পাঞ্চপাণ্ডবের কাছে কোনকিছু গোপন না করার পিছনে কারণ ছিল- নিজেকে অস্ত্রবিদ্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রমাণের কোন উদ্দেশ্য তার ছিল না। মহাভারতের ন্যায় নাটকে একলব্য সহজভাবে নিজের পরিচয় ব্যক্ত করেনি, কারণ এই একলব্য নিজের নাম বংশ পরিচয়ের পিছনে অর্জুনের আসল জানতে চাওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত। অর্জুনের তথা উঁচুশ্রেণীর ভাবনায় যে বোধ বিদ্যমান তা হলো—অস্ত্রবিদ্যায় অন্তঃজ শ্রেণীর অধিকার নেই আর একলব্য যদি সেই দলের অধিভুক্ত হয়, তবে অস্ত্রশিক্ষায় তার কোন অধিকারই রইবে না অতএব, অঙ্কুরেই এই সম্ভাবনার বীজ উৎপাটিত হবে। এ বাস্তববোধ দ্বারা তাড়িত হয়েই একলব্য কালক্ষেপণ করে উত্তর দানে অপরপক্ষে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন অপেক্ষার প্রহর গুণতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে এই নতুনকালের একলব্য আভিজাত্যে মোহাবিষ্ট অর্জুনের মর্মমূলে আঘাত হেনে বীর অথচ ধূর্ত বলে অভিহিত করে অনায়াসে বলে:

> অন্যের পরিচয় জানতে চাওয়ার হেতু জন ভেদে, বর্ণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়, নিশ্চয় আপনি তা জানেন, বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন। আপনি যে কারণে আমার পরিচয় নিয়ে এত চিন্তিত তা আমি নিশ্চিত। সপ্তশর নিক্ষেপ কৌশলে আপনার অন্তরে এক অন্তহীন বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে, এই

> বোধ এখন আপনার মনে অতীব প্রকট যে এই অজ্ঞাতনামা শাখামৃগের সখা আপনার চেয়েও পরাক্রমী বীর। আমি ক্ষত্রিয় কিনা, অস্ত্রবিদ্যা অধ্যয়নের আছে কিনা অধিকার আমার, পরিচয় জেনে মূলে তাই-ই নিশ্চিত হতে চান আপনি। বীরেরা ধূর্ত হয় কেবল কুরুপাণ্ডবকূলে। (রেজা ২০০৪: ১৯)

মহাভারতে অর্জুনের অস্ত্রকুশলতার সঙ্গে বাক্ চাতুর্যের বহু উদাহরণ লভ্য, পক্ষান্তরে একলব্য নিতান্ত সরল বীর, অস্ত্রশাস্ত্রে অর্জুনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিন্তু চাতুর্যে তার কাছে শিশুতুল্য। *নিত্যপুরাণ* নাটকে নাট্যকার অর্জুনের চেয়েও সুতীক্ষ্ণ চিন্তা করার ক্ষমতা আর বাক্ কুশলতায় গড়েছেন একলব্যকে। তার প্রমাণ মিলে সত্য অথচ রূঢ়তা মিশানো একলব্যের সংলাপে। এবাক্য প্রয়োগে যথার্থই একলব্য অর্জুনকে ক্ষিপ্ত করে তুলে এবং পরবর্তীতে তার নিম্নকূল আর সর্বোচ্চ অস্ত্র কুশলতার কথা উচ্চারণ করে। অর্জুন তথা উচ্চ শ্রেণিভুক্তদের সৃষ্ট শ্রেণি বিভাজনের ভেদের মুখে আগেই কুলুপ আটিয়ে রেখেছিলেন, তাই বিনা দ্বিধায় এবার জাতি বর্ণের ঊর্ধ্বে নিজেকে শৌর্যবান বীর বলেই পরিচিত করে সগর্বে। বর্ণ-শ্রেণী-অস্ত্রকুশলতায় বিরোধের বাকবিতণ্ডায় যুক্তিতে হেরে যেতে থাকা ক্রোধান্বিত অর্জুনের সক্রোষ চিৎকারে নাটকে আবির্ভাব ঘটে বাকী চার পান্ডবের। একলব্যের বহু দিন পোষণ করা ইচ্ছা পূরণ হয়, তার সামনে পঞ্চপাণ্ডবের একত্র অবস্থানের ফলে। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে ধীরে এবার একলব্য নিজের সম্পূর্ণ পরিচয় দানে দ্রোণাচার্যের শিষ্য বলে জানান দেয়:

> হ্যাঁ, দ্রোণাচার্য। আমার শিক্ষাগুরু। একে একে সর্বপ্রকার অস্ত্রচালনার যথার্থ শিক্ষা আমি তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। স্বাভাবিক যা ঘটে তা হল গুরু দীক্ষা দেন শিষ্যকে আর এস্থানে ঠিক তার উল্টো, শিষ্যই দীক্ষা দিয়েছে গুরুকে গুরুরূপে।... এই আমার পরিচয়। আর ডাকবার জন্য একটা নাম আছে- একলব্য। সর্জবনের একাধিপতি একলব্য। নিষাদরাজ হিরণধনুর পুত্র, নিম্নবর্ণ। (রেজা ২০০৪: ২০-২১)

মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডব সন্দিগ্ধ হয় একলব্য দ্রোণাচার্যের শিষ্য একথা জানার পর। বিশেষত বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন তার অপেক্ষা কোন শিষ্যকে আচার্য বেশী শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলেছেন তা জেনে মনোঃক্ষুন্ন হয়—যেখানে আচার্য নিজেই তাকে কথা দিয়েছিলেন কোন ধনুর্ধর ব্যক্তি যাতে অর্জুনের সমকক্ষ না হতে পারে সেই ব্যবস্থা তিনি নেবেন। এই বচন, পঞ্চপাণ্ডবের কূটকৌশল আর দ্রোণাচার্যের দক্ষিণা চাওয়া একলব্যের কাছে এই তিনের সমন্বয়েই একলব্যকে আমরা শৌর্যহীন হতে দেখি মহাভারতে। কিন্তু নাটকের একলব্য তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে শুধুমাত্র এক সারমেয়র প্রতি শরক্ষেপণের মত ক্ষুদ্র বিষয়ে তুষ্ট নয়। সম্মুখ প্রতিযোগিতায় বীরের মত জয় হস্তগত করাই তার উদ্দেশ্য। ভীমসেন একলব্যকে হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করতে দৃঢ়চিত্ত দেখেও নিজ লক্ষ্যে অবিচল থাকে একলব্য। বরং সরব হয় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে বীরধর্মের কথা মনে করিয়ে দিলে। একলব্য যুধিষ্ঠিরের নিজেদের বীর বলে পরিচয়ের বিপরীতে সৌভাগ্যবান সুবিধাবাদী বলে কথার তীর ছুঁড়ে দেয়:

> বীর আপনারা কেউই নন সত্যবান যুধিষ্ঠির। সবাই আপনারা সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী সৌভাগ্যবান। রাজললাট আর দেবদত্ত সুযোগের বলেই আপনারা বীর। হস্তিনাপুরের সবচেয়ে অক্ষম যে, এরূপ সুযোগ আর সৌভাগ্য পেলে সেও হতে পারত আপনাদেরই সমকক্ষ বীর। ছোট কিংবা বড়, সাদা কিংবা কালো সব পাথরেই আগুন থাকে, সত্য মানেন নিশ্চয়? (রেজা ২০০৪: ২৩)

মহাভারত এবং নাটক উভয় ক্ষেত্রেই একলব্য দ্রোণাচার্যের প্রত্যাখ্যানের বিপরীতে কোন প্রশ্ন করে না, জানতে চায় না শিক্ষাদানে কেন এই বর্ণভেদ। বরং আত্মপ্রত্যয়ী একলব্য নিজ প্রচেষ্টায় পৌঁছে যায় অস্ত্রবিদ্যার চূড়ান্ত শিখরে। শিক্ষা লাভের প্রত্যক্ষ যে পদ্ধতি দ্রোণাচার্যের অসম্মতিতে তা থেকে বঞ্চিত হয় একলব্য, তাই পরোক্ষ পদ্ধতির আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে না শিষ্য। গুরুর কাছে আত্মনিবেদন করে তার মৃন্ময় মূর্তি গড়ে, বিসর্জন দেয় জাগতিক মান অভিমান আর অপমান সুলভ সবকিছু। সামনে মূক বধির মৃন্ময় মূর্তিকে গুরুজ্ঞানে স্থাপন করে আত্মসংযম আর ত্যাগকে আত্মগত করে ভীষণ একাগ্রতায় অস্ত্রশিক্ষা শুরু করে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থানে পৌঁছায়। কেবলমাত্র নিম্ন বর্ণপরিচয়ে দ্রোণাচার্যের শিষ্যত্ব দানে অসম্মতি একলব্যকে রুখতে পারেনি। বিপরীতে পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি দেবতারা সদয়—জন্ম তাদের রাজকূলে। রাজানুগ্রহে দ্রোণাচার্য তাদের শিক্ষাগুরু নির্বাচিত হয়, সেই শিক্ষাই তাদের বীর বলে পরিচিত করে, এতে পঞ্চপাণ্ডবের কোন বিশেষ অর্জন নেই। দেব আর রাজানুকূল্যে যে কোন সাধারণ মানুষের ভেতর থেকেও প্রতিভার স্ফূরণ তথা সাফল্য সম্ভব। কিন্তু অসম্ভব সর্ব প্রাতিকূল্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা, তা সম্ভব করে দেখিয়েছে নিষাদ পুত্র একলব্য।

মহাভারতের ন্যায় নাটকেও পাণ্ডবকূল অপ্রতিদ্বন্দ্বী চাতুর্যে, নাটকে তার পরিচয় মিলে অর্জুনের নকুল সহদেবকে নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে স্থানত্যাগের ছলে দ্রোণাচার্যকে খবর পাঠানোর অভিসন্ধিতে। কিন্তু নব্যকালের একলব্য পুরোনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে এবার তৎপর, অর্জুনের ঘটনাস্থল ত্যাগের অর্থ আগেই বলে দিয়ে অর্জুনের পথরুদ্ধ করে দেয়। নিজেদের শক্তি সম্পর্কে ধারণা রাখা যুধিষ্ঠির একলব্যকে এড়াতে চায় উন্মত্ত বলে। কিন্তু অর্জুন সহ বাকী তিন পাণ্ডব বাধা দেয় যুধিষ্ঠিরকে—একলব্য সংহারে তারা সহমত। বাধ্য হয়ে যুধিষ্ঠির বিধান দেন একলব্য আর পাণ্ডবদের মধ্যে শৌর্য প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হত্যা করতে পারবে পরাজিতকে। পঞ্চপান্ডবের পক্ষে লড়বে অর্জুন—একলব্যের বিপরীতে। সম্মুখ সমরে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট অর্জন একলব্যের এইজন্যের প্রকৃত চাওয়া তাই সহাস্যে যে কোন অস্ত্রবিদ্যায় লড়তে সে সম্মত হয়। চতুর অর্জুন একলব্যের শরক্ষেপণের পারদর্শিতা দেখে এ প্রতিযোগিতায় পরাজয় নিশ্চিত জেনে, প্রতিযোগিতার বিষয় নির্বাচন করে বাণ ক্ষেপণ। গভীর অন্ধকার অরণ্যে বাণক্ষেপনের বিষয় নির্বাচনেও অর্জুনের চাতুর্য প্রমাণিত কারণ মাতা কুন্তীর কারণে অর্জুন অন্ধকারেও দেখতে সক্ষম, আর দেবানুকূল্যে ভীমসেনের আছে বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। সাধারণ বনচারী মানব একলব্য মানব-দেবতা কারো আনুকূল্য লাভেই

সক্ষম নয়, সুতরাং এ প্রতিযোগিতায় অর্জুনের বিজয় সুনিশ্চিত। প্রতিযোগিতার বিষয়—গভীর অরণ্যের বৃক্ষশাখায় বাঁধা এক কুঞ্চিত কুন্তল ভেদ। দ্রৌপদীর কুঞ্চিত কুন্তল ভেদের ব্যর্থতা মানতে বাধ্য হয় অর্জুন কিন্তু কারণ হিসেবে পঞ্চপাণ্ডব দাঁড় করায়—শ্যেণ পাখির ডানার বাতাসে কুন্তল দুলে ওঠাকে। যুধিষ্ঠির ঘোষণা করেন যদি একলব্য ব্যর্থ হয় কুন্তল ভেদে তবে একলব্যই হবে পরাজিত হিসেবে চিহ্নিত কারণ, অর্জুন লক্ষ্যভেদের ব্যর্থতা শ্যেণ পাখির কারণে, আর একলব্য যদি ব্যর্থ হয় তবে কারণ হবে তার অদক্ষতা। নিজ অনুশীলনের উপর আস্থা থাকা একলব্য এই অসম্ভব যুক্তিও মেনে নেয় অনায়াসে। এবার পরাজয়ের ভয় গ্রাস করে চতুর যুধিষ্ঠিরকে, তাই প্রতিযোগিতা এড়াতে একলব্যকে ভ্রাতৃত্বের আহ্বান জানানোয় তৎপর হয় ধর্মপুত্র:

> একলব্য, কৈশোর পেরিয়ে তুমি এক সদ্যজাত যুবক, দারুণ সম্ভাবনাময়। প্রকৃতই শিখেছ তুমি সর্বাস্ত্রের সফল প্রয়োগ, অর্জুনের সমকক্ষ তুমি। যদি লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হও, তবে মৃত্যু তোমার নিশ্চিত। তুমি আমাকে মুগ্ধ করেছ, পার্থরূপে জ্ঞান করছি তোমায়, তোমার মৃত্যু আমাকে ভ্রাতৃবিয়োগের বেদনা দেবে। ...সুতরাং মৃত্যুকে নয়, আলিঙ্গন কর এই ভ্রাতৃগণকে। হস্তিনাপুরে চল। বীরের যোগ্য সম্মান দেব তোমায়। তোমার অশিষ্টাচারের জন্য ক্ষমা প্রার্থণা কর শুধু। ক্ষমা করে দেব, আর গ্রহণ কর আমার ভ্রাতৃত্ব। (রেজা ২০০৪: ২৭)

সরল একলব্যের নজর এড়ায় না ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃত্বের আহ্বানের অন্তরালের কপটতা। একলব্য জানে যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃত্বের আহবান প্রকৃতত অর্জুন তথা পঞ্চপাণ্ডবের পরাজিত হওয়া থেকে বাঁচার কৌশল মাত্র। নবকালের একলব্য ইতিহাস পরম্পরায় ঘটে যাওয়া ভ্রাতৃত্বের অবমাননাকে তুলে ধরে যুধিষ্ঠিরের বাড়ানো হাত সবিনয়ে ফিরিয়ে দেয়:

> মহাভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে অধিকবার লুণ্ঠিত হয়েছে যা; তা হল ভ্রাতৃত্ব। ভাই ভাইয়ের বিরূদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে অন্যায় যুদ্ধে, চাতুর্য আর ধূর্ততায় ভাই হনন করেছে ভাইকে। (রেজা ২০০৪: ২৭)

যুধিষ্ঠিরের আশংকা সত্য প্রমাণিত হয়, প্রতিযোগিতায় বাণ ক্ষেপণে একলব্য ভেদ করে দ্রৌপদীর কুন্তল। অর্জুন তথা পঞ্চপাণ্ডব পরাজিত হয়। যে মৃত্যুর ভয় এতক্ষণ যুধিষ্ঠির একলব্যকে দেখাচ্ছিলেন তা এসে দাঁড়ায় পঞ্চপাণ্ডবের সামনে। পুরাণ পাল্টে দিতে এবার তৎপর হয় একলব্য। বাধ সাধে যখন একলব্যের দীর্ঘ সময় আর একাগ্রতার ফসল বিষাক্ত পাঁচটি বাণের একটি যখন পাওয়া না যায়। উদার একলব্য ঘোষণা দেয়—বাঁচবে এক পাণ্ডবের প্রাণ! পঞ্চপাণ্ডবের সকলেই বাঁচার আকুলতা মনে নিয়ে মুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত। সরল একলব্য কৌতূহলী হয়ে আশ্চর্য এক উপায় অবলম্বন করে—দ্রৌপদী নির্বাচন করবে সেই এক পাণ্ডব। যুধিষ্ঠিরের চাতুর্যে অর্জুন দুই বাণ ছোঁড়ায়, একলব্যের সন্দেহের প্রশ্নে যুধিষ্ঠির সতর্কতার সাথে বলে:

> এটাই যথার্থ কৌশল। ...তবে...অর্জুনের। যুধিষ্ঠিরের প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বাক্যের শেষাংশ উচ্চারণ সরল বীর একলব্যের কানে পৌঁছায় না। প্রকৃত সত্য এই, এক বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে পঞ্চপাণ্ডব ভার্যা দ্রৌপদীর উদ্দেশ্যে, অপর বাণে দ্রোণাচার্যের কাছে পাঠানো হয়েছে বিপদ

> সংকেত। পঞ্চপাণ্ডবের শঠতা আর চাতুর্য এবারও একলব্যকে ঠেলে দেয় নিষ্ঠুর ভবিতব্যের দিকে! (রেজা ২০০৪: ৩১)

মহাভারতে একলব্যের সাথে দ্রৌপদীর সাক্ষাতের কোন প্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায় না কিন্তু নাটকে একলব্য দ্রৌপদীর সাক্ষাৎ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে একলব্য এবং দ্রৌপদী দুই চরিত্রেরই মানসলোক উন্মোচিত হয়েছে। দীর্ঘ সময় ইন্দ্রিয় সংযম, অস্ত্র শিক্ষা আর ত্যাগে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো একলব্যের দ্রৌপদীর সৌন্দর্য বর্ণনায় যে সৌন্দর্যতৃষ্ণা প্রকাশ পায়, তা একলব্যের মনের গভীর অন্তর্লোককে ভালোবাসার আলোয় আলোকিত করেছে। একান্ত পূজারী রূপে একলব্যের রূপবর্ণনায় স্বয়ং দ্রৌপদীও মোহিত হয়। নারী নিজেকে যেমনরূপে দেখতে চায় সঙ্গীর চোখে, ঠিক সেইভাবেই যেন একলব্য আবিষ্কার করে দ্রৌপদীকে। পঞ্চস্বামী লাভেও দ্রৌপদী যে ভালোবাসার জন্য তৃষ্ণার্ত তা এক মুহূর্তেই একলব্যের চোখে দেখতে পায় সে । একলব্যও দ্রৌপদীর মতই ভালোবাসার কাঙ্গাল নাটকে। যুবক একলব্য দ্রোণাচার্যকে গুরুরূপে পাবার বাসনা পোষণ করেছিল, শিষ্যত্ব দানে তাকে ভালোবাসা-স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করেননি দ্রোণাচার্য বরং বিনিময়ে নিক্ষেপ করেন বর্ণ নিকৃষ্টতার ঘৃণা। জগৎজয়ী বীর হিসেবে পাণ্ডবগণ তাকে স্বীকৃতি দান করে সরল শ্রদ্ধা-ভালোবাসার বন্ধনে বাধে নি, বরং অধিক শৌর্যবান বীরের প্রতি পোষণ করে পরাজিতের হিংসা-ক্রোধ, আশ্রয় নেয় চাতুর্য আর দমন প্রক্রিয়ার। এমনকি দ্রৌপদী যখন শৌর্যহীন একলব্যের মাথায় স্নেহমিশ্রিত সমবেদনার হাত রাখতে যায়, যুধিষ্ঠির থামিয়ে দেয় ভ্রষ্ঠা বলে নরকে স্থান হবে এই ভয় দেখিয়ে। জীবনে কিছুই না পাওয়া, ভালোবাসার জন্য তৃষ্ণার্ত একলব্য তারই মত দ্রৌপদীর সামনে নিজের ভালোবাসাকে প্রকাশ করে এভাবে:

> ভালোবাসা দ্রৌপদী, ভালোবাসা। ...অরণ্যচারী আমি, একা, না বেসেছি ভাল, না পেয়েছি ভালোবাসা কারও। ভালোবাসা চাই, দ্রৌপদীর ভালোবাসা, এক ফোঁটা ভালোবাসা দ্রৌপদীর। ওই আঙ্গুলীপঞ্চকের যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ, তার নখ থেকে তুলে দেওয়া এক ফোঁটা ভালোবাসা। দুর্বাঘাসের ডগায় এক বিন্দু শিশিরের মতো। সে ভালোবাসা দিয়ে দ্রৌপদী, পূর্ণ করুন একলব্যের শূন্য হৃদয়। (রেজা ২০০৪: ৪৪)

নাটকে পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে কে দ্রৌপদীকে সবচেয়ে ভালোবাসে এই সত্য জানার ছল হিসেবে একলব্য দ্রৌপদীর ভালোবাসার কাঙ্গাল হিসেবে নিজেকে জাহির করলেও, চাতুর্যের আড়লে ঢাকা পড়ে না একলব্যের ভালোবাসাহীন জীবনের নিঃসঙ্গতা। এই একলব্য নিঃসঙ্গ বনচারী কিন্তু তা সত্ত্বেও মানবিক এক মানুষ, তার পরিচয় মিলে নারী এমনকি পুরুষেরও অন্তর বোঝার ক্ষমতা দেখে। পঞ্চস্বামীর মধ্যে অর্জুন দ্রৌপদীর সবচেয়ে প্রিয় কিন্তু দ্রৌপদীকে সবার চেয়ে বেশী ভালোবাসে ভীমসেন—এই সত্যকে আড়াল করার শতচেষ্টা পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদী করলেও ঘটনার পরম্পরায় প্রকৃত সত্যকে সামনে এনে দাঁড় করায় একলব্য। আবার দ্রৌপদী যখন তার পঞ্চস্বামীর মধ্যে একজনকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য নির্বাচন করতে অক্ষমতা জানায় তখন একলব্য দ্বিধা না করে দ্রৌপদীকে আক্রমন করে ধর্ম, সংসার আর পুরুষ এই তিনের কারণে চতুর আর

কৌশলী বলে। তেমনি আক্রমণ করে সমাজকে, ফুঁসে ওঠে নারীকে আজন্ম কৌশলী হয়ে বাঁচতে বাধ্য করায় কথিত নিয়মের মুখোশধারী সমাজের বিরুদ্ধে। দ্রৌপদী সমব্যথী একলব্যের সামনে তাই অকপট:

> ...অন্তরে তার আগুন, ভীষণ রোষে সে দগ্ধ হয় প্রতিক্ষণ, ক্ষিপ্ত হয় সে অর্জুনের উপর। স্বয়ম্বর সভায় অর্জুন তাকে জয় করেছিল, অন্য কেউ নয়। দ্রৌপদীকে মুগ্ধ করেছিল অর্জুন, অন্য কেউ নয়। হঠাৎ কেন তবে দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের ভার্যা হয়ে গেল? কীভাবে? দ্রৌপদীকে জিজ্ঞেস করেনি কেউ তার ইচ্ছার কথা, পঞ্চপাণ্ডবের ভার্যা হতে তার মত আছে কিনা, কেউ জিজ্ঞেস করেনি। শাস্ত্র কিংবা বিধান কেন দ্রৌপদীর ইচ্ছের মূল্য দেবে না? কেন শাস্ত্র ওদের পক্ষ নেবে? দ্রৌপদীর দুঃখে সহায় হবে এমন শাস্ত্র কিংবা বিধান কি তবে নেই? কেন দ্রৌপদী নিজের ইচ্ছার বিরূদ্ধেও পাঁচজনের ভার্যা হবে সে? দ্রৌপদী বনিতা, বারবনিতা নাকি দ্রৌপদী? (রেজা ২০০৪: ৪৭-৪৮)

নারীর মর্মমূলে আঘাত করে একলব্য যে সত্য দ্রৌপদীর দ্বারা প্রকাশ করায় তা যেন সর্বকালের সব নারীর ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। একলব্যের জেরার মুখে দ্রৌপদীর এই উচ্চারণ সমাজ সংস্কার ধর্ম কিভাবে নিম্নবর্ণের মানুষের মতই নারীকে আবদ্ধ করে রেখেছে তার অনৈতিক শর্তে তারই প্রকাশ। শৌর্যবান একলব্যের নারীমন বোঝার ক্ষমতা তাকে বিশেষ মানবিক সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করেছে। একই সাথে এ দ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে নাট্যকার বুঝিয়েছেন, প্রতিভাবান অথচ নিম্নবর্ণে জন্মজাত একলব্য আর উঁচুকূলে নারীজন্ম পাওয়া দ্রৌপদী, সমাজের শ্রেণিবিভাজন আর সমাজনাম্নী পুরুষ সৃষ্ট লিঙ্গভেদের সুবিধাজনক তুলাদণ্ডে একইভাবে তুল্য হয়েছে।

মহাভারত এবং নাটক *নিত্যপুরাণ* উভয় ক্ষেত্রেই একলব্যের জীবনে শৌর্যহীনতার প্রথম এবং শেষ পেরেক গাঁথতে আসেন দ্রোণাচার্য। মহাভারতে অর্জুন-একলব্য শ্রেষ্ঠত্বের কোন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় না, অপ্রতিদ্বন্দ্বী একলব্যের অস্ত্র পারদর্শীতা দেখে অর্জুন দ্রোণাচার্যের দেওয়া কথার বিরূদ্ধাচারণের জবাব চায়। অর্জুনের চেয়ে বড় অস্ত্রশিষ্য ভবিষ্যতে তৈরী হবে না দ্রোণাচার্যের দ্বারা, একথা একদিন দ্রোণাচার্য দিয়েছিলেন স্বয়ং অর্জুনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে। প্রিয় শিষ্য অর্জুনের অভিমানে বিব্রত দ্রোণাচার্য পরবর্তীতে অর্জুনকেই সাথী করে একলব্যের সাথে সাক্ষাতে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী চান গুরুদক্ষিণা হিসেবে। 'গুরুকে অদেয় শিষ্যের কিছু নাই' বলে একলব্য অনায়াসে তার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ছেদন করে হাসিমুখে গুরুর পদমূলে দক্ষিণা দেন। *নিত্যপুরাণ* নাটকে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আর বীর অর্জুনের চাতুর্যে বিপদ সংকেত বাহী বাণ পৌঁছায় দ্রোণাচার্যের কাছে, ছুটে আসেন আচার্য শিষ্যদের রক্ষায়। পঞ্চপাণ্ডবকে শর্তানুযায়ী মৃত্যুর অপেক্ষায় দণ্ডায়মান দেখেন, তাঁকেই গুরুজ্ঞান করা একলব্যের সামনে। মহাভারতে অর্জুন নির্জনে আচার্যের প্রতি অভিমান প্রকাশ করে একলব্যকে শ্রেষ্ঠ বীর হিসেবে তৈরী করায়, তারপর আচার্য সহযোগে শৌর্যনাশ করে একলব্যের। নাটকে অর্জুনের অভিমানের সেই ছলও নেই, বরং প্রকাশ্যে একলব্যকে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠবীর জানিয়ে সে কারণেই তাকে বিনাশ করার নিষ্ঠুর ইচ্ছার কথা জানায় দ্রোণাচার্যকে:

> আমি যদি আচার্য সবচেয়ে প্রিয় আপনার, শুনুন আমার একান্ত অভিলাষ—একথা সন্দেহের অতীত যে আমার চেয়েও বড় বীর এই অর্বাচীন, বড় তীরন্দাজ, আমি চাই এর সমূলে বিনাশ। (রেজা ২০০৪: ৫১)

দ্রোণাচার্য মহাভারতে নিজের মৃন্ময় মূর্তিকে গুরুর আসনে আসীন দেখে অকপটে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ একলব্যের ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী দাবী করেন। নাটকের দ্রোণাচার্য আর্য সম্প্রদায়ের চতুর প্রতিনিধি, তিনি মিষ্টি কথায় একলব্যকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়ে জানতে চান পাণ্ডবদের কিভাবে হত্যা করা হবে। স্পষ্টভাষী একলব্যের শরবিদ্ধ করে পাণ্ডব বধের পরিকল্পনার নিশ্চিত উত্তর পেয়ে, দ্রোণাচার্য গুরুদক্ষিণা দাবী করেন একলব্যের কাছে: "তোমার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী আমি চাই।" (রেজা ২০০৪: ৫১) মহাভারতে একলব্য নির্দ্বিধায় গুরুদক্ষিণা দান করে আচার্যকে, নাটকের একলব্য আগের জন্মের শৌর্যহীনতার পুনরাবৃত্তি রুখতে শেষ আশ্রয় প্রার্থনা করে দ্রৌপদীর কাছে। শর্ত রক্ষা করতে গেলে দ্রোণাচার্য একলব্যের প্রতি দ্রৌপদীর সহানুভূতিকে পাপ বলে রুখে দেন দ্রৌপদীকে। শর্তভঙ্গের লঘুতর পাপ মেনে নিয়ে দ্রৌপদীকে থেমে যেতে হয়। অভিমানক্ষুব্ধ একলব্য বর্তমান জন্মেও ভবিতব্যের দিকে এগিয়ে যায়, ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী গুরুদক্ষিণা হিসেবে দ্রোণাচার্যকে দান করে। এখানে প্রশ্ন আসে দ্রোণাচার্য আর একলব্যের গুরু-শিষ্য সম্পর্কের—প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দ্রোণাচার্য অতীতে হস্তিনাপুরে শিষ্যত্বে বরণ করেননি একলব্যকে নিষাদপুত্র বলে। কিন্তু পরবর্তীতে পঞ্চপাণ্ডবের বিপদের মুখে তিনি চাতুর্যের সাথে গুরুদক্ষিণা দাবী করেন। গুরুদক্ষিণার প্রসঙ্গ একলব্যকে শিষ্য হিসেবে মেনে নেবার সাপেক্ষে আসে, অর্থাৎ নিষাদপুত্র একলব্যকে দ্রোণাচার্য মেনে নিচ্ছেন শিষ্য হিসেবে। উল্লেখ্য, একলব্য হস্তিনাপুরে যখন দ্রোণাচার্যকে গুরুরূপে প্রার্থনা করেছিল, তখন দ্রোণাচার্য ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য কাউকে শিক্ষাদান তার শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলে জানিয়েছিলেন। বিপদের মুখে সেই শাস্ত্রাচারী দ্রোণাচার্যই শাস্ত্রের বিরূদ্ধাচারণ করে নিজেকে একলব্যের গুরুর আসনে বসাতে দ্বিধা করেন না, নিজেকে নিষাদপুত্রের সংস্পর্শে হীন বলেও বোধ করেন না। যেভাবে সমাজের উঁচুকূলের সুবিধাভোগীরা নিজেদের সৃষ্ট শাস্ত্রকে নিজেদের প্রয়োজনানুযায়ী পাল্টে নিয়েছে, সেভাবেই পাল্টে নেন দ্রোণাচার্যও। "শাস্ত্রের এক বিধান যা নিষিদ্ধ করে, অন্য কোন বিধান, অন্য কোনভাবে তারই দেয় অনুমোদন।" (রেজা ২০০৪: ২৪) আর জীবনে মিথ্যাচারের আশ্রয় না নেওয়া একলব্য তো পূর্বেই বলেছে "শিষ্যই দীক্ষা দিয়েছে গুরুকে গুরুরূপে।" তাই নিজবাক্য ফিরিয়ে নিতে কপটতার আশ্রয় সে নেয় না। কারণ—নিষাদ একলব্য অস্ত্রশাস্ত্র শিখেছে, শিখেনি আর্যোচিত কূটচাল, তাই সহসা গুরু দাবী করা দ্রোণাচার্যকে উপেক্ষা করা তার পক্ষে সক্ষম হয় না। অসম্ভব হয় দ্রোণাচার্যের ভাবশিষ্য বলে মানা নিজেকে স্বশিক্ষায় বলে শিক্ষিত বলে প্রচার করে দ্রোণাচার্য আর পঞ্চপাণ্ডবের চক্রান্তকে ভেস্তে দেওয়া। গুরুদক্ষিণা দেওয়া একলব্যকে শুধু তার ক্ষোভ উগড়ে দিতে দেখা যায় অসাধু মিথ্যাচারী উচ্চবর্ণের প্রতি:

> নিন আচার্য, আপনার গুরুদক্ষিণা নিন। আমার দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী নিন, আচার্য। আপনার গুরুদক্ষিণা নেওয়ার ভেতর দিয়ে জগতে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হোক যে ক্ষত্রিয় ছাড়াও নিম্নবর্ণের অচ্ছুৎকে আপনি দীক্ষা দেন, শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। সঙ্গে আরও এক সত্যও প্রকৃত সত্যরূপে সিদ্ধ হোক যে ব্রাহ্মণেরাও মিথ্যাচার করে। নিন। (রেজা ২০০৪: ৫২)

মহাভারতের একলব্য গুরুদক্ষিণা প্রদানের পর অবশিষ্ট চার আঙ্গুল দিয়ে শরক্ষেপণের চেষ্টা করে, বাণ আর আগের মত অব্যর্থ গন্তব্যে তীব্রগতিতে ছুটে না, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আগেই ভূপাতিত হয়। একলব্য দমনে সফল দ্রোণাচার্য প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে দেওয়া বাক্যের মান রেখে নিশ্চিন্ত হন। মহাভারতের অর্জুন অস্ত্রবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্বের যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়েও চাতুর্যের সাথে বিজয় হস্তগত করে। নাটকের দ্রোণাচার্য আরো ক্রুঢ়, একলব্যের গুরুদক্ষিণা পেয়ে একলব্যকে তার লক্ষে অগ্রসর হতে বলেন। একলব্য ব্যর্থ হয় শরনিক্ষেপে, ব্যর্থতায় কেঁদে ওঠা একলব্যের কান্না শুনে নিষ্ঠুর অট্টহাসিতে মেতে উঠে পঞ্চপাণ্ডব। মৃগয়ায় রওনা হওয়া পাণ্ডবদের দলে যোগ দেন দ্রোণাচার্যও। যাওয়ার আগে আচার্যরূপে একলব্যকে প্রবোধ দেন: "...আমাকে যদি কেউ জগতে শ্রেষ্ঠবীরের কথা জিজ্ঞেস করে, অর্জুনের সাথে আমি তোমার নামও বলব। আসি। সার্থক ও সফল হোক তোমার জীবন।" (রেজা ২০০৪: ৫৩)

মহাভারতে দ্রোণাচার্য একলব্যের ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণা হিসেবে গ্রহণ করে নিশ্চিন্ত হন, অর্জুনের কাছে করা তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয়। মহাবীর অর্জুন নিশ্চিত ভাবেই জানতেন অস্ত্রশাস্ত্রে অবশ্যই তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবীর স্বশিক্ষিত বনচারী এই নিষাদপুত্র একলব্য, ভবিষ্যতের পথের বাধা দূর করতে তাই বীরসুলভ সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার চেয়ে উত্তম পথ হিসেবে বিবেচিত হয় দ্রোণাচার্যের আশ্রয় নেওয়া। বিনা যুদ্ধে অর্জুন একলব্যের মূল শক্তি কেড়ে নিয়ে ভবিষ্যতের পথ কণ্টকমুক্ত করে। মহাভারতের অর্জুনের মধ্যে বীর ক্ষত্রিয় কিংবা রাজোচিত কোন আচরণ একলব্যের সাথে ঘটা ঘটনায় অন্তত দেখা যায় না, বরং সম্মুখ যুদ্ধ পরিহারের পলায়ন নীতিই তার কাছে একলব্য রোধে আদর্শ মনে হয়েছে। নাটকের অর্জুন বীরের ধর্ম অনুসারে একলব্যের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং পরাজয় বরণ করে। পরাজয়ে পঞ্চপাণ্ডবের জীবনের পরিণতি হিসেবে যখন মৃত্যু নির্ধারিত হয়, তখন ক্ষত্রিয়ের নীতি পরিত্যাগে তার বাধে না। নির্দ্বিধায় চাতুর্য অবলম্বন করে দ্রোণাচার্যকে সংবাদ পাঠায় এবং পঞ্চপাণ্ডবের প্রাণ রক্ষার সাথে সাথে পরম পরাক্রান্ত প্রতিযোগীকে চিরদিনের জন্য রাস্তা থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থাও নিশ্চিত করে। এখানে উল্লেখ্য শ্রেষ্ঠ হবার পন্থা দুই—এক. নিজেকে শ্রেষ্ঠ কীর্তিমান হিসেবে গড়ে তোলা, যা নিষাদ একলব্য করেছিল। দুই. শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার অন্য কীর্তিমানের কীর্তিকে দমন করার চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করা, চাতুর্যের সাহায্যে যে দমন নীতির আশ্রয় দ্রোণাচার্য, অর্জুনসহ পঞ্চপাণ্ডব নিয়েছিল।

মহাভারতে বৃদ্ধাঙ্গুলী গুরুদক্ষিণা হিসেবে দানের পরও একলব্য দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন এমন প্রমাণ মিলে, তাকে পাওয়া যায় যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নিষাদগোষ্ঠীর প্রতিনিধি

হিসেবে। একলব্যের জীবনের সমাপ্তি ঘটে কৌরব-পাণ্ডবদের মহাযুদ্ধের পূর্বে একলব্য কৃষ্ণ মতান্তরে বলরামের হাতে—যদিও এ নিয়ে মতভেদ নিতান্ত কম নয়। *নিত্যপুরাণ* নাটকে এক্ষেত্রে নাট্যকার পুরাণ অনুনগামী, স্বশিক্ষায় নিজেকে শ্রেষ্ঠবীর হিসেবে গড়ে তোলা একলব্যের শৌর্যহীন জীবন নাট্যকার দীর্ঘায়িত করাননি। তাই নিজহাতে চালিত অগ্নী চক্র একলব্যের হৃদয়কে বিদ্ধ করে এবং আর্য সম্প্রদায়ের কূটচাল আর চাতুর্যের দ্বৈরথে শেষ হয় একলব্য নাম্নী এক শ্রেষ্ঠবীরের জীবন।

দমন পীড়ন নীতি মানব ইতিহাসের সমান প্রাচীন। আপন বলে বলীয়ান শ্রেষ্ঠজনকে উচ্চ সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ সর্বকালেই ঠেকাতে চেয়েছে বল দ্বারা। পরাজয়ে আশ্রয় নিয়েছে কৌশলের, দমন হয়েছে প্রবল পরাক্রমশালী বীরের, টিকে থেকেছে অন্যায়ের আশ্রয় নেওয়া ক্ষমতাধর। নাট্যকার মহাভারতের একলব্যের ক্ষুদ্র আখ্যানের আশ্রয়ে যে নতুন একলব্যকে গড়েছেন সেই একলব্য মহাভারতের একলব্যের মতই এক পরাক্রমশালী বীর। কিন্তু মহাভারতের আংশিক আখ্যান ছাড়িয়ে নাটকের বিনির্মাণে এই একলব্য চরিত্র মানবিকতায় উচ্চ কূলজাত মানুষের চেয়ে অনেক বেশী মানবিক কিন্তু পরিশেষে মহাভারত অনুসারেই সমাজ ও নিয়তির নিষ্ঠুর দমন নীতির শিকার অসহায় এক মানব।

তথ্যসূত্র

চৌধুরী, কবীর (২০০৮)। *সাহিত্যকোষ*। মাওলা ব্রাদার্স।

ব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (২০০৯)। *মহাভারত* (রাজশেখর বসু, অনু.)। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

রেজা, মাসুম (২০০৪)। *নিত্যপুরাণ*। যুক্ত প্রকাশনী।